The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVIII, 2022 (pp.139 - 148)
Published in July, 2025

বাসন্তী দেবী : ইতিহাসে এক অনালোচিত ব্যক্তিত্ব

সৈয়দ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম*

প্রতিপাদ্যসার: বাসন্তী দেবী (১৮৮০-১৯৭৪ খ্রি.) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ কারাগারে কারারুদ্ধ প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী নারী। মূলত ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে সহিংস ও অহিংস উভয় পদ্ধতিতেই বহু নারী অংশগ্রহণ করলেও বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে যে সমস্ত নারী সর্বপ্রথম আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে আসেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন বাসন্তী দেবী। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শুধু স্ত্রীই ছিলেন না, ছিলেন সঙ্গিনী, বান্ধবী, সচিব, পরামর্শদাত্রী এবং রাজনৈতিক জীবনের সহযোগী। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তিনি দলীয় পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিয়েছেন, দৃপ্ত ভাষণও দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন দাশের সাহিত্য সাধনার অনুপ্রেরণার উৎসও ছিলেন তিনি। অসহযোগ আন্দোলন করতে গিয়ে কারাবরণও করতে হয়েছিলো তাঁকে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উপর তাঁর প্রভাব ছিলো অপরিসীম। তিনি তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন। বাসন্তী দেবীর রাজনৈতিক জীবন স্বল্পস্থায়ী হলেও বিশ শতকের বাংলার নারী জাগরণে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তিনি উপেক্ষিতই থেকে গেছেন। চিত্তরঞ্জন দাশের বহুল প্রচারিত জীবনী গ্রন্থগুলিতে রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে বাসন্ত দেবীর উল্লেখ নেই বললে চলে। যেটুকু আছে তা হলো স্ত্রী ও গৃহিণী হিসেবে তাঁর সপ্রশংস উল্লেখ। তাই নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন তুলে ধরা প্রয়োজন। আলোচ্য প্রবন্ধে এ মহীয়সী নারীর কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা

বিশ শতকের প্রথম দিকে পরাধীন ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার মন্ত্র নিয়ে যেসব রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ নারী স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বাসন্তী দেবী। মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রি.) ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় হবার পর থেকেই নারীরা গৃহকোণ থেকে বের হয়ে স্বাধীকার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর উত্থান আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে ব্রিটিশবিরোধী যে আন্দোলন শুরু হয়, তাতে তিনি নেতৃত্ব দেন। ফলে ভারতের রাজনীতি অন্য ধারায় আলোকিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতের রাজনীতিতে সাধারণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। এখানে উল্লেখ্য যে, গান্ধীজীর রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের সময় কংগ্রেস ছিলো শুধুমাত্র একটি সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। ১৯১৫ সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্বদেশে ফিরে তিনটি শ্রমিক-কৃষক আঞ্চলিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন, যার প্রধান কর্মসূচী ছিলো সত্যাগ্রহ এবং আন্দোলনগুলো পরিচালিত হয়েছিলো জমির মালিক, ব্যবসায়ী শ্রেণি ও রাজস্ব আদায়কারীদের বিরুদ্ধে। গান্ধীর এই আন্দোলনের প্রধান শরিক ছিলো সাধারণ মানুষ, যারা এতোদিন ভারতীয় রাজনীতিতে উপেক্ষিত ছিলো। এভাবে ভারতের রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ১৯২০ সালে গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল কথা ছিলো সরকারের সাথে সব রকমের

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

অসহযোগিতা করা, বিদেশী পণ্য বর্জন করা, স্বদেশী জিনিসের মাধ্যমে নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া, এবং ইংরেজদের কাছ থেকে স্বরাজ আদায় করা। এই রাজনৈতিক গণ-আন্দোলন একই সঙ্গে ভারতীয় নারী-জাগৃতির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধি। এই আন্দোলনে গান্ধী ভারতের নারীদের দেশমাতার মুক্তির আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার আহবান জানান। তিনি নারীদের যে আত্মনিবেদনের বা দেশপূজার কথা বলেছিলেন, সেটি তাদের মনোজগতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাই গান্ধীর আহবানে নারীরা দলে দলে স্বাধীকার আন্দোলনে যুক্ত হয় (রায়, ১৯৮৯: ৪৪)। তাৎপর্যময় এই অহিংস আন্দোলনের জন্য নৈতিকভাবে নারীরা পুরুষের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য কারণ এই আন্দোলনে গোপনীয়তার স্থান ছিলো না; আবার প্রথম দিকে চরম আত্মত্যাগেরও তেমন প্রয়োজন ছিলো না। নারীমুক্তিবাদী ঐতিহাসিকদের মতে, নারী মানবজাতির অর্ধেক হলেও প্রচলিত ইতিহাস রচনায় তারা সর্বদা অবহেলিত। আলোচ্য প্রবন্ধে এমনই এক নারী, বাসন্তী দেবী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যিনি ইতিহাসে উপেক্ষিত থেকে গেছেন (রায়, ১৯৮৯: ৩৭)।

পরিচয়: বাসন্তী দেবী ১৮৮০ সালের ২৩ শে মার্চ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বরদানাথ হালদার ও মাতা হরিসুন্দরী দেবী। তিনি পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরে। বাসন্তী দেবীর পিতা আসামের বিজনী ও অভয়পুরী স্টেটের দেওয়ান ছিলেন। এই আসামেই বাসন্তী দেবীর শৈশব কেটেছে। পরে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং ১৮৯০ সালে লরেটো হাউসে ভর্তি হন (দাশগুপ্ত, ১৩৭০: ৪৬)। বাসন্তী দেবীর বিয়ে হয়েছিলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে ১৮৯৭ সালে। তিনি শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি স্বামীর সাথে স্বদেশ-পরিক্রমা এবং বিভিন্ন সামাজিক সমিতিগত কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কর্মজীবন শুরু করে কিছুদিনের মধ্যেই চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যারিস্টার হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেন। তিনি ১৯১৭ সাল পর্যন্ত আইনপেশার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা করতেন। পরবর্তীতে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আইনপেশা ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে বাসন্তী দেবী ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের উপযুক্ত সহধর্মিণী (দাশগুপ্ত, ২০১৫: ৭০)। লরেটো স্কুলে পড়াশুনা করা অবস্থায় জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রতি তাঁর যে আগ্রহ তৈরী হয়েছিল, তা স্বামীর মাধ্যমে আরো বেশী উৎকর্ষতা লাভ করে। স্বামীর উৎসাহে তিনি পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলন এবং বাংলার কংগ্রেসের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনে বাসন্তী দেবী: মহাত্মা গান্ধীর আহবানে সাড়া দিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালি নারী অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে। ১৯২০ সালের কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে গঠিত হয় নারী 'স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী'। সংঘবদ্ধভাবে বাঙালি নারীর প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এই প্রথম (দাশগুপ্ত, ১৩৭০: ০৫)। নারীদের অনেকে কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রহণ করলে তাঁর সঙ্গে এগিয়ে আসেন স্ত্রী বাসন্তী দেবী। বাসন্তী দেবীর রাজনীতিতে যোগদান বাংলার নারীদের রাজনৈতিকায়নের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলায় নারীদের নেতৃত্বে ছিলেন বাসন্তী দেবী এবং তাঁর ননদ ঊর্মিলা দেবী (১৮৮৩-১৯৫৬)। চিত্তরঞ্জনের মেয়ে অপর্ণা দেবী বলেন-

> বাড়ি এসেই সবকিছু বিলাসদ্রব্য ফেলে দিলেন বাবা। তিনি হাসি মুখে মোটা, খাটো খদ্দরের ধুতি ও ফিনফিনে পাতলা পাঞ্জাবির বদলে মোটা খদ্দরের ফতুয়া পরিধান করলেন। মাও বাবার সঙ্গে মোটা খদ্দরে শোভিত হলেন। অথচ মা ঢাকাই শাড়ির মোটা পাড় পর্যন্ত তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সর্বদা সেজন্য তিনি মিহি শান্তিপুরী শাড়ি পরতেন (দেবী, ২০১০: ১৫৪)।

অসহযোগ আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার জন্য বাসন্তী দেবী স্বামীর সাথে অবিভক্ত বাংলার বহু জেলা ভ্রমণ করেন এবং সর্বত্রই মেয়েদের নিয়ে সভা, শোভাযাত্রা করেছেন। চরকা কাটা, খদ্দর বিক্রি এবং স্বদেশী জিনিস প্রচারে উদ্বুদ্ধ করেছেন, একই সঙ্গে মেয়েদের কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আহবান জানিয়েছেন। কলকাতায় বিভিন্ন বিদেশি পণ্য বিক্রয়কেন্দ্রে মেয়েদের পিকেটিংয়ে নেতৃত্ব দেন বাসন্তী দেবী (মুরশিদ, ২০১২: ২৬৪)। বলা যায়, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একজন স্বাধীনতা কর্মী হিসেবে তিনি তৃণমূল আন্দোলনকে জোরদার করেছেন এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

১৯২১ সালের ৬ ডিসেম্বর ছেলে চিররঞ্জন দাশ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগ দিতে চাইলে বাসন্তী দেবী তাকে বাধা দেননি, বরং আনন্দপূর্ণ চিত্তেই সংসারে তাঁর প্রিয়তম সম্পদকে দেশসেবার্থে পাঠিয়ে গর্ব অনুভব করেছিলেন। নিজের সন্তানকে দেশের জন্য পাঠিয়ে পরের সন্তানকে আহ্বান করতে বাসন্তী দেবীর আর কোনো সংকোচ রইলো না। সেদিনই ২১ জন স্বেচ্ছাসেবকসহ চিররঞ্জন দাশ গ্রেফতার হলেন এবং রাতে অমানুষিক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হলেন। এ সময় কলকাতায় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা কারারুদ্ধ হতে থাকে। ফলে নারীরা পুরুষদের স্থান পূরণে এগিয়ে আসে। ছেলের গ্রেফতারের পরের দিনই বাসন্তী দেবী বেরিয়ে পড়লেন কলকাতার রাস্তায় আইন অমান্য করে খদ্দর বিক্রি ও হরতাল ঘোষণা করতে। তাঁর সঙ্গে গেলেন ঊর্মিলা দেবী, এবং নারী কর্মমন্দিরের একজন কর্মী সুনীতি দেবী। আইন অমান্য করার কারণে তাঁদের আটক করা হয়। অসহযোগ আন্দোলনে বাংলায় নারীদের গ্রেফতার হবার ঘটনা এই প্রথম (বেগম, ২০১৬: ১৪৯)। বাসন্তী দেবী গ্রেফতার হবার সাথে সাথে থানার সামনে জনতা ছেয়ে ফেলল। থানা থেকে তাঁদের নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। পরে বাসন্তী দেবীর অনুরোধে জনতা রাস্তা ছেড়ে দেয়। তাঁদের লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁরা মুচলেকা দিতে অস্বীকার করেন। তারপর তাঁদের নেয়া হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। তাঁরা জামিনে মুক্ত হতেও অস্বীকার করলেন। পরে রাত ১১টার দিকে তাঁদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সরকার। বাসন্তী দেবীর গ্রেফতারের পরই সারা বাংলায় উত্তেজনা দেখা দেয়। তরুণরা দলে দলে এগিয়ে আসতে লাগলো। মেয়েরাও সাড়া দিলো। বাঙালি জাতির সে এক বিরাট জাগরণ। সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের একজন গৃহবধূর এমনভাবে দেশের কাজে পথে নেমে আসায় জন-আবেগ উত্তাল হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন-

> যখন শহরে এই সংবাদ ছড়িয়ে গেল যে, শ্রীযুক্তা দাশ ও অন্যান্য মহিলাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তখন ভীষণ উত্তেজনা দেখা দিল। দারুণ ক্ষোভে বৃদ্ধ-যুবা, ধনী-দরিদ্র স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্য আসতে শুরু করলো। কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে শহরটিকে এক সেনাশিবিরে পরিণত করলেন। কিন্তু ততক্ষণে আমরা অর্ধেক যুদ্ধ জয় করে ফেলেছি। এই ক্ষোভ কেবলমাত্র জনগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলো না, এতদিন পর্যন্ত যে পুলিশ কর্মচারীরা আনুগত্যের পরিচয় দিয়ে এসেছে তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। জেলে নীত হবার জন্য থানায় শ্রীযুক্তা দাশ যেই পুলিশের গাড়িতে চড়তে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বহু পুলিশ কনস্টেবল তাঁর কাছে এসে প্রতিজ্ঞা করলো যে, তারা সেইদিনই তাদের চাকরি থেকে ইস্তফা দিবে। গভর্নমেন্ট মহলে ভয় ধরে গেলো। তখনও কেউ জানতো না, এই সংক্রমণ কতদূর ছড়াবে। তৎক্ষণাৎ গভর্নমেন্ট আদেশ প্রচার করলেন যে, পুলিশ কনস্টবলদের বেতন যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হবে। উত্তেজনা এত প্রবল হয়েছিলো যে, গভর্নমেন্ট মধ্যরাত্রির আগেই শ্রীযুক্তা দাশ ও তাঁর সঙ্গীনীদের মুক্তির আদেশ দিতে হয়েছিলো, এবং জনসাধারণকে বোঝাতে হয়েছিলো যে ভুল করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরদিন থেকে, হাজার হাজার ছাত্র ও কারখানা শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবকের তালিকায় নাম লেখাতে শুরু করলো। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শহরের বড় দুটি জেল রাজনৈতিক বন্দিদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেলো। তখন তাবু গেড়ে জেল তৈরি করা হল, কিন্তু সেগুলোও বেশিদিন অপূর্ণ থাকলো না। গভর্নমেন্ট কঠোর ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। দেশবন্ধু দাশ ও তাঁর ঘনিষ্ট সহযোগীদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হলো, এবং ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার মধ্যে আমরা সকলেই কারারুদ্ধ হলাম (বসু, ১৯৯৯: ৩৭-৩৮)।

এই আন্দোলনে নারীকর্মীরা প্রতিদিনই রাস্তায় নেমে আসতো এবং চলার পথে পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য উৎসাহীদের সমবেত করতেন। নারীরা গান গাইতো এবং পুরুষ সমর্থকরা দোকানদারদের বিদেশী কাপড়ের ব্যবসা বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গুদামজাত করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করতো। মিছিলে প্রায় তিন থেকে চারশো লোক যাত্রা করতো। মুক্তির পরের দিনই বাসন্তী দেবী মির্জাপুর স্ট্রিটের এক জনসভায় নেতৃত্ব দেন। এই সময় পুলিশ কমিশনার বলেন-"বাংলার পুরুষেরা মেয়েদের আঁচলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে এবং কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলন মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে" (রায়, ১৯৮৯: ৪৯-৫০)। অর্থাৎ চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে প্রথম মহিলা হিসেবে বাসন্তী দেবীর নেতৃত্ব দানের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার নারীদের এই কারাবরণের ঘটনা সমগ্র ভারতবাসীর কাছেও একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলার নারীরা এই আন্দোলনে তাঁদের জন্য নির্ধারিত ভূমিকাকে অতিক্রম করলো এই কারাবরণের মাধ্যমে এবং পুরুষের বিকল্প বা সহযোগী হিসেবেই কেবল নয়, বরং সমান ভূমিকায় নিজেদের নিয়ে আসতে সক্ষম তা প্রমাণিত হয়। ১০ ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন দাশকে গ্রেফতার করা হয়। স্বামী এবং সন্তানকে গ্রেফতার করার পরও বাসন্তী দেবী মোটেও বিচলিত হননি, বরং স্বামী-পুত্রের গৌরবে গৌরবান্বিত হলেন। স্বামীর অবর্তমানে তিনি আন্দোলনের নেতৃত্ব হাতে তুলে নিলেন। চিত্তরঞ্জন জেলে থাকা অবস্থায় *বাংলার কথা* পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন বাসন্তী দেবী (রায়, ১৯৮৯: ৪৭)। মূলত স্বামীর অবর্তমানে আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্বের পাশাপাশি জাগরণের অন্যতম বাহন সাময়িকী প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রেও স্বীয় যোগ্যতার অনন্য নজির স্থাপন করেন।

বাসন্তী দেবীর রাজনৈতিক জীবনের আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো স্বামীর অনুপস্থিতিতে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করা। এই ঘটনা দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের পুরোভাগে একজন নারীকে নিয়ে আসে। প্রথমবারের মতো একজন বাঙালি নারী কংগ্রেসের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন, এবং এটিকে বাঙালি নারীর রাজনৈতিক জাগরণের মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সম্মেলনে নারী শ্রোতাদের উপস্থিতির সংখ্যা অতিক্রম করে পূর্বেকার সমস্ত রেকর্ড। স্বভাবতই সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রশ্ন উঠেছিলো যে, এ ঘটনার কারণ কি একজন মহিলার সভাপতিত্ব গ্রহণ না বাঙালি নারীর রাজনৈতিক জাগরণ (রায়, ১৯৮৯: ৫২)। সার্বিকভাবে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এই পর্বে বাঙালি নারীর অংশগ্রহণ একটি ভিন্নমাত্রা যোগ করে। বাসন্তী দেবী এই অধিবেশনে তাঁর বক্তব্যে গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব কিছুটা সংশোধন করে কাউন্সিলে প্রবেশকে অসহযোগের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে বলেন-

> কাউন্সিলে প্রবেশ করে আমরা অসহযোগিতা করবো। যতদিন না আমাদের প্রাপ্য অধিকার স্বীকার করা হয়, ততদিন ভালমন্দ সমস্ত বিষয়ে কর্তপক্ষকে বাধা দেওয়াই হয়ত আমাদের কাউন্সিলে কাজ হইবে। ভরসা করি জাতীয় মহাসমিতির আগামী অধিবেশনে এই বিষয় ভাল করিয়া বিবেচিত হইবে (দেবী, ২০১০: ১৭৮)।

তাঁর এই বক্তব্যে সভাসদরা খুব বিস্মিত হলেন। সকলে ভাবলেন এ শুধু মহাত্মার প্রস্তাবেরই বিরোধিতা নয়, দেশবন্ধুও এমন কথা বলেননি। কিন্তু তাঁরা জানতো না দেশবন্ধুই কারাগার থেকে এই প্রস্তাব বাসন্তীদেবীর মুখ দিয়ে দেশবাসীকে শুনিয়েছেন। তিনি মনে করেছিলেন, মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ থেকে কাউন্সিলে প্রবেশ করে অসহযোগ অধিক কার্যকর হবে। এই অভিভাষণে বাসন্তী দেবী শুধু রাজনৈতিক বিষয়ে বক্তব্যই দেননি, গ্রামীণ ভারতের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। তিনি বক্তব্যে বলেন-"যদি প্রাচীন ভারতের সহজ ও সর্বোৎকৃষ্ট জীবন ধারাটিতে আমাদের ফিরে যেতেই হয় তাহলে ঘুমিয়ে থাকা গ্রামগুলিকে আমাদের জাগাতেই হবে। আধুনিক জীবনের শর্তাদি নিয়েই গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলি নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামগুলিকে আমাদের পুনর্গঠন

করতে হবে (রায়, ১৯৮৯: ৪৮)।" গ্রামীণ অর্থনীতি ও কুটিরশিল্প পুনঃপ্রবর্তনের মাধ্যমে মহিলাদের হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি অর্থ আয়ের উৎস তাদের হাতের ফিরিয়ে দেবার আহবান জানান বাসন্তী দেবী। সমকালীন সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী তাঁর ভাষণ শ্রোতাদের কাছে 'বিশেষ আবেদনময়' হয়ে উঠে এবং বিপিনচন্দ্র পালের বক্তব্যের থেকেও অধিক মাত্রায় কার্যকর হয়। বিশেষ করে সম্মেলনে নারীদের বিপুল উপস্থিতি তাঁদের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত করে যে, প্রতিদিনকার গৃহকর্ম ও সন্তান লালন-পালনের বাইরে একটি জগৎ বিদ্যমান এবং সেই স্থানে পুরুষের পাশাপাশি নারী হিসেবে অংশগ্রহণ এবং দায়িত্ব পালন করার অধিকার আছে। ফলে বিভিন্ন সভা-সমিতি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পুস্তিকাতে নারীদের স্বদেশমূলক লেখনি প্রকাশিত হয়। পরবর্তী গণ-সংগ্রামগুলিতে আরো বেশি করে নারীরা অংশগ্রহণ করে এবং নেতৃত্বের বিভিন্ন সারিতেও তাঁরা উঠে এসেছিলো। নারী নেতৃত্বের বিকাশের অগ্রদূত হিসেবে এই স্বীকৃতি বাসন্তী দেবীরই প্রাপ্য (মিস্ত্রী, ২০১৮: ৬৯৭)।

অসহযোগ আন্দোলনে ভারতীয়দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং এই আন্দোলনের সাফল্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীকে শক্তিকে শংকিত করে তোলে। কিন্তু ১৯২২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি চৌরিচৌরায় প্রতিবাদী জনতা ও পুলিশের সংঘর্ষে তিন জন আন্দোলন কারী নিহত হয়। গান্ধী অনুভব করেন আন্দোলন বিপথে চলে যাচ্ছে। তাই তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। ফলে দেশবন্ধুসহ বাংলার অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতারা ক্ষুব্ধ হন। দেশবন্ধু জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তাঁর সম-মতাবলম্বীদের সঙ্গে একজোট হয়ে স্বরাজ্য পার্টি গঠন করেন এবং দ্বিতীয় বঙ্গীয় আইনপরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন (Chand, 1972: 4)। বেঙ্গল প্যাক্টের কারণে ১৯২৪ সালের নির্বাচনে মুসলমানদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের ফলে স্বরাজ্য পার্টি কলকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব লাভ করে এবং অন্যদিকে যশোর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ও নদীয়াসহ অন্যান্য মফস্বলের পৌরসভাতেও বিজয় ছিল লক্ষণীয়। চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। এই সময় চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য ফান্ডে অর্থ সংগ্রহের জন্য উত্তরবঙ্গ, জলপাইগুড়ি, ও বিভিন্ন অঞ্চলে যখন যান, সেই সময় বাসন্তী দেবীও তাঁর সঙ্গে অর্থ সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এরপরে আমরা বাসন্তী দেবীকে আর কোনো রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় হতে দেখেনি। ১৯২৫ সালে স্বামী মারা যায়, এরপরে একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনও (১৯২৬) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁদের মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন তিনি বেঁচে ছিলেন। কিন্তু রাজনীতিতে কখনোও আসেননি। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ছেদ টানলেও স্বামীর প্রতিষ্ঠিত কল্যাণমূলক কর্মকেন্দ্রের কাজ দেখাশুনা করতেন (সেনগুপ্ত, ১৯৯৮: ৬০)।

দেশবন্ধুর উপর বাসন্তী দেবীর প্রভাব: দেশবন্ধুর যোগ্য সহধর্মিণী ছিলেন বাসন্তী দেবী। কোনো সফল পুরুষের জীবনে একজন নারীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান থাকে অপরিসীম-তা তিনি জননী হোন বা জায়া বা ভগিনী হোন। দেশবন্ধুর জীবনে বাসন্তী দেবীও তাই। শুধুমাত্র সংসার ধর্ম পালন করে তিনি স্বামীর প্রতি কর্তব্য শেষ করেননি, স্বামীর দেশসেবায় সহকর্মীরূপে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাসিমুখে কারাবরণ করেছেন। কিন্তু তিনি দেশবরেণ্য স্বামীর ছায়ামাত্র নন, নির্বিকার অনুগামী নন। প্রয়োজনে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, আত্মোৎসর্গে পিছপা নন, আবার রাজনৈতিক উন্মাদনার মধ্যেও সঠিক পথটি চিনে নিতে পারেন। দেশবন্ধুর মতো সুবিশাল ব্যক্তিত্বের ছায়ায় বাসন্তী দেবী কখনো ঢাকা পড়ে যাননি, বরং যোগ্যতার সঙ্গে ঘর ও বাইরে সমানভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজনৈতিক সংগঠক, আইনজীবী, প্রশাসক, সাহিত্য-রচয়িতা ইত্যাদি পরিচয়ের আধার চিত্তরঞ্জনের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি ছিলে মহৎ জীবনাদর্শ-অনুসারী মানবতাবাদী ন্যায়বান এবং স্বাধীনচেতা একজন মানুষ (আজিজ, ২০১৯: ৭০)। তাই দেশবন্ধুর মতো একজন সর্বান্তঃকরণ দেশকর্মীর জীবনে এ রকমই একজন সেবাব্রতা নারীর

ভূমিকা প্রয়োজন ছিলো, যে তাঁর কর্মসাধনাকে সার্থক করে তুলবেন। চিত্তরঞ্জন দাশের যৌথ পরিবারের সব দায়িত্ব পরিবারের বড় জন হিসেবে তাঁর উপর বর্তায়। দেউলিয়া হয়েও তিনি সংসারের প্রেষণ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাননি। অহর্নিশ এরকম চিন্তাজালে জড়িত হয়েও তিনি কর্মসাগরে ঝাপিয়ে পড়তেন কারণ এই কঠিন সময়ে তিনি বাসন্তী দেবীকে পাশে পেয়েছেন। শ্বশুরকুলের সুখ, দুঃখ, আনন্দ ও দায়িত্ব সব অকুণ্ঠিত চিত্তে বহন করে বাসন্তী দেবী স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কন্যা অপর্ণা দেবী লিখেছে-

> মাকে সহধর্মিণীরূপে পেয়েছিলেন বলেই পিতৃদেব সংসারের প্রচন্ড বাধা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। একদিন সন্ধ্যাবৈঠকে মা'র অসাক্ষাতে বাবা বললেন, 'তোদের মা কখনো নিজের জন্য কিছু চায়নি, আমাদের সংসারে তিল তিল করে ও নিজেকে বিলিয়ে দিল ; কোনোদিন ওর মুখে কোনো অভিযোগ শুনিনি'। মা-র সম্বন্ধে তাঁর এরকম উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথা প্রায়ই তিনি আমাদের কাছে বলতেন।...তাই ভাবি, আজ দেশবন্ধুকে সকলেই জানে, শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে। কিন্তু তাঁকে দশের বন্ধু, দেশের বন্ধুরূপে সবার সামনে এস দাড়াবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন কে? তিনি জননী বাসন্তী দেবী (দেবী, ২০১০: ৩৯)।

১৯১৯ সালে নিখিল ভারতীয় মহিলা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে বাসন্তী দেবীকে সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল। এই সভার অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন "মনে রাখিবেন, আমাদের আদর্শ সতী, সাবিত্রী ও সীতা। যদি প্রয়োজন মনে হয় তাহা হইলে বর্তমানকালের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য সেই ভারতীয় আদর্শকে সংস্কার করিয়া নিন কিন্তু ভারতের সেই চিরন্তন আদর্শকে নষ্ট করিবেন না" (মিস্ত্রী, ২০১৭: ৬)। এই অভিভাষণের আদর্শই ছিল বাসন্তী দেবীর জীবনের আদর্শ। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী এবং চিত্তরঞ্জন দাশের সমঝোতায় অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। সরকারি চাকরিজীবীগণ নিজ নিজ কাজ ত্যাগ করে দেশবন্ধুর পাশে দাঁড়ান। নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনের পর থেকে চিত্তরঞ্জন দাশ একেবারেই আইন ব্যবসা ত্যাগ করে দেশমাতৃকার মুক্তির সেবায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বাসগৃহ পরিণত হলো রাজনৈতিক সংগঠনের দপ্তর। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ নিজ চেষ্টায় প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হয়েছিলেন। রাজার মতো জীবনযাপন করতেন। দান করতেন দানবীরের চেয়েও বেশি। কাপড় ধোলাই হতো যার প্যারিসের লন্ড্রিতে, সেই মানুষটিই দেশের জন্য সমস্ত সুখ-শান্তি, গাড়ি বাড়ি ত্যাগ করে সপরিবারে রাজপথে নামেন (হোসেন, ২০১২: ৭)। দেশবন্ধুর আইন ব্যবসা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় মাসে ৫০/৬০ হাজার টাকার আয়। তিনি বাসন্তী দেবীকে বলেছিলেন-"জানি তোমাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে কিন্তু আমি কি করবো? আমি যে আর এর মধ্যে থাকতে পারছি না।" বাসন্তী দেবীও যোগ্য সহধর্মিণী, স্বামীর সফল আইন ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে উত্তর দিলেন, "অর্থকে পৃথিবীর বড়ো সম্পদ বলে আমি মনে করি না, তা তো তুমি জানো। তোমার এই সংকল্পে আমি তোমার পাশে রয়েছি। দৈহিক আরাম যদি তুমি ছেড়ে দিতে পারো, তোমার স্ত্রী হয়ে কি আমি তা পারবো না? (চৌধুরী, ১৯৭১: ১২০)।" স্ত্রীর সহানুভূতি পেয়ে চিত্তরঞ্জন দাশ পরম শান্তি পেলেন। স্বামীর স্বদেশপ্রেমের ব্রতের সহায়ক হতে প্রথম সহযোগীরূপে কারাবরণ, উচ্চবিত্ত সমাজের মসৃণ জীবন থেকে একেবারে ধূলিধূসর রাজপথে নেমে আসা বাসন্তী দেবীর এই সর্বংসহা অথচ তেজস্বী মূর্তি দেশবন্ধুকে অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছে দেয়।

১৯২১ সালে চাঁদপুরে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। চা-শ্রমিকদের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই ধর্মঘট। সেখানে বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনারের নির্দেশে শ্রমিকদের উপর গুলি চালানো হয় এবং প্রাণহানি ঘটে। চিত্তরঞ্জন দাশ স্ত্রীকে নিয়ে চাঁদপুর যেতে চাইলেন, কিন্তু জাহাজের শ্রমিকেরা চা-শ্রমিকদের সাথে সহানুভূতি

প্রদর্শন করে স্টিমার চলাচল বন্ধ রাখে। চিত্তরঞ্জন দাশ নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে জেলেডিঙ্গি নিয়ে চাঁদপুর রওয়ানা দিলেন। অপর্ণা দেবী লিখেছেন- "ঝড়বৃষ্টির সময় তখন; পদ্মা ও কীর্তিনাশা সেসময়ে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে তাণ্ডবনৃত্যে উন্মত্তা হয়ে রোষগর্জনে যেন সংহারের জন্যই উদ্দাম হয়ে উঠেছে। এই নদীতে ক্ষুদ্র জেলেডিঙ্গিতে যাওয়া মানেই মৃত্যুকে বরণ করা (দেবী, ২০১০ : ১৫৬)।" এই কঠিন দুঃসময়েও বাসন্তী দেবী স্বামীর সাথে ছিলেন, সাহস এবং প্রেরণা দিয়েছেন। চাঁদপুরের অসহায় শ্রমিকদের করুণ মুখচ্ছবির কাছে তাঁদের প্রাণের মায়া ছিলো তুচ্ছ। ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে যখন মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হয়ে জেলে বন্দি ছিলেন, সেই সময় চট্টগ্রামে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি সভানেতৃত্ব করেন এবং স্বামীর নতুন কর্মপন্থার ইঙ্গিত দেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের সাথে সহযোগী হিসেবে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন বাসন্তী দেবী। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় না থাকলেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মানবসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচল রেখেছিলেন।

আমৃত্যু স্বদেশ-স্বজাতি তথা মানবমুক্তির জন্য কাজ করে যাওয়া চিত্তরঞ্জন বাংলা সাহিত্যেরও একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রবন্ধ, বক্তৃতা রচনার পাশাপাশি গল্প, কবিতা, গান ও কাব্য সমালোচনাতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যে অত্যাচার, নিপীড়ন, মানুষের সে দুঃখ কষ্ট আর ব্যথার কথা চিত্তরঞ্জনের লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তিনি আইন পেশার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা করেন। পরে দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি আর এ পথে থাকতে পারেননি। সাহিত্য জীবনে চিত্তরঞ্জনের অন্যতম প্রেরণাদাত্রী, সমালোচক ও পাঠিকা ছিলেন বাসন্তী দেবী। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন কারাগারে ছিলেন, তাঁর সম্পাদিত *বাংলার কথা* পত্রিকাটির দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্ত্রী বাসন্তী দেবী। *বঙ্কিমসাহিত্য* ও *বৈষ্ণব পদাবলী* ছিল তাঁর খুব প্রিয়। তবে তাঁকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে তা হলো *বৈষ্ণব সাহিত্য*। তাঁর স্ত্রীই প্রথম তাঁকে বৈষ্ণবপদাবলীর রস আস্বাদন করান। পরবর্তীতে এই সাহিত্যের প্রতি তিনি এতই আসক্ত হয়েছিলেন যে, তা শুধু তাঁর সাহিত্য দৃষ্টিকে প্রভাবিত করেনি, অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরতেন, ঘরের বাতি নিভিয়ে 'মাধব বহুত মিনতি কঁরু তোয়' গানটি শুনতেন। কন্যা অপর্ণা দেবীকে বলেছিলেন, মৃত্যুশয্যায় তাঁকে যেনো এই গানটি শোনানো হয় (মণীন্দ্র দত্ত ও হারাধন দত্ত, ১৩৪৬: ২৩০)। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি লেখায় চিত্তরঞ্জন দাশের উপর বাসন্তী দেবীর প্রভাব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন-"দেশবন্ধুর এই বিরাট ত্যাগের নির্ভৃত অন্তরালে আর একজন আছেন-তিনি বাসন্তী দেবী। একদিন উর্মিলা দেবী আমাকে বলিয়াছিলেন, দাদার এত বড় কাজের মধ্যে আর একজনের হাত নিঃশব্দে কাজ করে; সে আমাদের বৌ। নইলে দাদা কতখানি কি করতে পারতেন, আমার ভারি সন্দেহ হয়" (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৯: ১০০০)। চিত্তরঞ্জন দাশ ভবানীপুরের বাড়িসহ তাঁর সব সম্পদ দেশের কাজে দান করেছিলেন, তখন বাসন্তী দেবী দুঃখিত না হয়ে স্বামীর এই মহত্বপূর্ণ কাজকে ভীষণভাবে সমর্থন করেছিলেন। একটি পরিবার দেশের স্বাধীনতার জন্য সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন-সেটিই বোধহয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও বাসন্তী দেবী প্রমাণ করেছিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও বাসন্তী দেবী: ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক মহানায়ক হলেন সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫ খ্রি.)। যিনি এই সংগ্রামের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন সুভাষ বসুর শিক্ষক, নেতা ও পথপ্রদর্শক। ১৯২১ সালে রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার পর অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সাথে মতপার্থক্য হয় সুভাষ বসুর। এসময় বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। চিত্তরঞ্জন দাশ গান্ধীর চেয়ে বেশি নমনীয় ও চরমপন্থার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, যা সে সময়

বাংলার আদর্শবাদী তরুণদের আকৃষ্ট করেছিল। চিত্তরঞ্জন দাশের হাত ধরে সুভাষ বসু জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে যোগ দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবে সুভাষ বসুর সাথে দেশবন্ধু জায়া বাসন্তী দেবীর পরিচয় হয়। সুভাষ বসু তাঁকে 'মা' বলে সম্মোধন করতেন। বাসন্তী দেবীর স্নেহচ্ছায়ামাখা প্রেরণায় সুভাষ বসু জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সফল হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের সাথে সহযোগী হিসেবে ছিলেন বাসন্তী দেবী, যা সুভাষ বসুকে মুগ্ধ করেছিলো। তাঁর সামনে রাজনীতির এক অসাধারণ মহীয়সী রূপ খুলে যায়। ঝাঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের একটা সময় সুভাষ বসু নিজের মায়ের চেয়ে বাসন্তী দেবীর বেশি কাছের ছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। এমনকি তাঁর মা প্রভাবতী দেবীও একবার বাসন্তী দেবীকে বলেছিলেন, "আপনিই মা, আমি ধাত্রী" (বসু, ১৯৯৩: ৫৭)। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সুশিক্ষা, ও স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী বাসন্তী দেবীর প্রভাব সুভাষের জীবনে দেশবন্ধুর চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। তাই ইতিহাসবিদ লেনার্ড লিখেছেন, "Not only Das become his political guru, but Das and his wife became like surrogate parents" (Gordon, 1997: 82)।

সুভাষচন্দ্রের উপর বাসন্তী দেবীর স্নেহ ছিলো মায়ের মতো স্বতোৎসারিত। সেই স্নেহের টানেই তিনি তাকে 'মা' বলে ডাকতেন। আপন জন্মধাত্রীর সঙ্গে একাসনে তাঁকে বসিয়েছিলেন সুভাষ বসু। বাসন্তী দেবী প্রণীত *সুভাষ স্মৃতি*তে তাঁদের অন্তরঙ্গ স্নেহভক্তির ছবিটি বড় অকৃত্রিমভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানে বাসন্তী দেবী লিখেছেন-তাঁর উপর সুভাষ বসুর ছিলো দুরন্ত শিশুর মতো যত জেদ, যত আবদার, যত অভিমান। সারাদিনের বিরামহীন কর্মব্যস্ততার শেষে রাত্রি এগারোটার পরে বাসন্তী দেবীর কাছে এসে খেতে চাইতেন সুভাষ বসু। স্নেহ-সকরুণ জননীর মতোই বাসন্তী দেবী গভীর রাতে ভাত সিদ্ধ করে ক্লান্ত, ক্ষুধার্থ সুভাষ বসুর মুখে তুলে দিতেন (দেবী, ১৯৭০: ৩)। শুধু অবুঝ আবদারই নয়, নানা বিষয়ে সুভাষ বসু বাসন্তী দেবীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এমনকি জটিল রাজনীতির কঠিন আবর্তেও তিনি সুভাষ বসুকে দিশা দেখিয়েছেন, সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছেন। রাজনীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিলো বাসন্তী দেবীর। তাই সুভাষ বসুর মতো দেশনায়কও তাঁকে মেনে চলতেন। আদর্শ মাতৃভক্তির যে স্বপ্ন সুভাষ বসু বহুকাল ধরে অন্তরে লালন করেছিলেন-তাকেই তিনি বাসন্তী দেবীর মধ্যে চাক্ষুস করেছিলেন। সে মূর্তি আসলে জন্মধাত্রী, ধাত্রী আর দেশমাতৃকার এক সম্মিলিত রূপ। বেঙ্গল প্যাক্টের কারণে ১৯২৪ সালের নির্বাচনে মুসলমানদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের ফলে স্বরাজ্য পার্টি কলকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব লাভ করে। এই আন্দোলনে চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে ছিলেন সুভাষ বসু। তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়ে সুভাষ বসুকে চিফ একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু সুভাষ বসু তাতে তীব্র আপত্তি জানায়। তখন দেশবন্ধু বাসন্তী দেবীকে বলেন-"See if you can manage him..After a prolonged argument Basanti Devi persuaded him to accept the post" (Bose, 1972)। মা বাসন্তী দেবীর কথায় প্রভাবিত হয়ে সুভাষ বসু দায়িত্বটা নিয়েছিলেন। প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবেও সুভাষ বসু সফল হয়েছিলেন।

বাসন্তী দেবী সাধারণ হিন্দু রমণীর মতই স্বামীর মৃত্যুকে জীবনের পরিসমাপ্তি বলে ধরে নিয়েছিলেন। সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু সুভাষ বসু বার বার আকুতি জানিয়ে বলেছেন বাসন্তী দেবী যেনো তাঁর দেশবরেণ্য স্বামীর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করেন। এ আহবান দুটি কারণে সুভাষ বসু করেছিলেন। প্রথমত তিনি বাসন্তী দেবীকে বাংলায় নারী স্বাধীনতার অগ্রদূত রূপে দেখেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর সহজাত নেতৃত্বগুণ, যেটা কাজে লাগিয়ে চলমান জাতীয় আন্দোলনকে আরও জোরদার ও ফলপ্রসূ করা। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর ১৯২৫ সালের ৬ জুলাই জেল থেকে বাসন্তী দেবীকে লেখেন,"যে আহবানে আপনি একদিন বাঙালির শিরায় শিরায় নবজীবন সঞ্চার

করিয়াছিলেন, সেই আহবানে আপনি আর একবার বাঙালিকে জাগান। যে মন্ত্রবলে আপনি একদিন বাংলার ঘরে ঘরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন-সেই মন্ত্র লইয়া, মহাশক্তিরূপে আপনি আর একবার আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হউন (চৌধুরী, ১৯৭১: ১০)।" দেশবন্ধু ছিলেন তরুণদের রাজা, আর তাঁর পতিব্রতা সাধ্বী পত্নী ছিলেন তরুণদের মাতা, নিখিল বঙ্গের মাতা। মা এখানে কেবল আক্ষরিক অর্থে মা নন-সন্তানকে, যুবসমাজকে নির্দিষ্ট লক্ষে চালনা করার, নিয়ন্ত্রণ করার এক যোগ্য নেত্রী এবং চালিকাশক্তি। সংগ্রামী যুব সমাজের মুখপাত্র সুভাষ বসু যুক্তিসহকারে বাসন্তী দেবীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা ও প্রয়োজন কতখানি। দীর্ঘ চিঠিতে সুভাষ বসু লিখেছেন-

> আজ বাংলার বড় দুর্দিন। আমাদের একমাত্র ভরসা আপনি। আপনাকে শুধু কোনো দল বিশেষ চায় না-সমগ্র দেশ আপনাকে চায়।...তারা চায় না যে আপনাকে পথে, ঘাটে, মাঠে ঘোরাঘুরি করে বক্তৃতা করে বেড়াতে হবে। তারা চায় আপনার উপদেশ ও পরামর্শ-তারা চায় জগতে ঘোষণা করতে যে, দেশবন্ধুর আরাধ্য কাজসমূহ আপনি ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করেছেন-তারা শুধু দেখতে চায় যে, দেশবন্ধুর অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্খা আপনার জীবনে সফল ও সার্থক হয়ে উঠছে। যারা দেশবন্ধুকে সুখে দুঃখে অনুসরণ করেছে-আজও তারা সেই devotion এর সাথে আপনাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তবে একবার পরীক্ষা করে দেখুন। আপনার কথায় বাঙ্গালা দেশ ওঠে বসে কিনা তা আপনি ইচ্ছে করলেই পরীক্ষা করতে পারেন (বসু, ১৯৬৪: ২৮৬)।

সুভাষ বসুর বারংবার অনুরোধ, অনুনয় কিংবা প্রত্যাশা কোনো কিছুই বাসন্তী দেবীকে আর ফেরাতে পারেনি। বাসন্তী দেবীর এইভাবে অন্তরালে চলে যাওয়া সুভাষ বসুকে যারপরনাই ব্যথিত করেছিল। কিন্তু অদম্য প্রাণ শক্তির আধার সুভাষ বসু সহজে হাল ছাড়েননি। এরপরেও ১৯২৯ সালে শিলং থেকে বাসন্তী দেবীকে পাঠানো এক চিঠিতে লিখেছেন-"আমার সারা জীবনে যিনি একাধারে আমার বন্ধু, সখা ও গুরু ছিলেন তিনি আজ নাই। আজ আমি যে একেবারে কাঙ্গাল। সে কাঙ্গালের একমাত্র আশ্রয় আজ আপনি (বসু, ২০০০: ১৫১)।" চিঠিগুলো পড়লে বুঝা যায় বাসন্তী দেবী সুভাষ বসুকে কতখানি প্রভাবিত করেছেন, কতখানি আন্তরিকভাবে তিনি এই মাকে তাঁর গুরুর স্থলাভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পরে বাইরের জগত থেকে বাসন্তী দেবী প্রায় পুরোপুরি যখন সরে এসেছেন তখনও জাতপাতবিরোধী কর্ম থেকে তিনি বিরত হননি। মুষ্টিমেয় যে কয়টি জায়গায় তাঁকে বাইরের জগতে দেখা গেছে তার একটি হলো, ১৯৩২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বর্জনের দাবীতে বিখ্যাত অনশনের সমর্থনে সেবিকাদল নবাবগঞ্জে গান্ধী সপ্তাহের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ সভা, সমবেত প্রার্থনা, হরিজন বস্তিতে পরিভ্রমণ, বস্ত্র বিতরণ ও খদ্দের বিক্রয় করা হয়। সেখানে বাসন্তী দেবী এলে তাঁকে বিশেষ অভ্যর্থনা জানানো হয়। তাঁর উদ্দীপিত ভাষণে অস্পৃশ্যতা বর্জন ও মহিলাদের উন্নতির বিষয়গুলি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে (মিস্ত্রী, ২০১৭: ৯)। এই মহিয়সী নারীর ১৯৭৪ সালের ৭ই মে জীবনাবসান ঘটে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে চরম রাজনৈতিক সংকটে একজন বিপ্লবী স্বাধীনতা কর্মী হিসেবে তিনি অনন্য ভূমিকার পাশাপাশি বাংলার নারী জাগরণে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা অনবদ্য।

উপসংহার: বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে বাসন্তী দেবীর অংশগ্রহণ হঠাৎ আলোর ঝলকানি হিসেবে থেকে গেলো। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি বাইরের জগৎ থেকে অন্তঃপুরে ফিরে গিয়ে বাকী জীবন কাটালেও স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা তথা ভারতের নারীদের অংশগ্রহণের যে নব দিগন্ত খুলে দিয়েছেন, তার দরজা কখনো বন্ধ হয়নি। পরবর্তী গণ-সংগ্রামগুলিতে আরও বেশি বেশি করে মহিলারা অংশ নিয়েছিল, নেতৃত্বের বিভিন্ন সারিতেও তারা উঠে এসেছিল। এই নারী জাগরণের পথ প্রদর্শকের সম্মান ও স্বীকৃতি বাসন্তীর দেবীরই প্রাপ্য। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তিনি উপেক্ষিতই থেকে গেছেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই কলকাতায় 'বাসন্তী দেবী কলেজ' (১৯৫৯) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণে সম্মানিত করেন। পরিশেষে বলা যেতে পারে বাসন্তী দেবীর রাজনৈতিক জীবন অল্প দিনের হলেও বিশ শতকের বাংলার নারী জাগরণে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র

অপর্ণা দেবী, *মানুষ চিত্তরঞ্জন*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১০।

কমলা দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, জয়শ্রী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৭০।

কাজী জাকির হোসেন, *রবীন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জন দাশ*, মূর্ধন্য, ঢাকা, ২০১২।

কৃষ্ণা বসু, *প্রসঙ্গ সুভাষচন্দ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩।

গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর, ঢাকা, ২০১২।

বাসন্তী দেবী, *সুভাষ স্মৃতি*, বিশ্বনাথ দে (সম্পা.), সাহিত্যম, কলকাতা, ১৯৭০।

মণীন্দ্র দত্ত ও হারাধন দত্ত (সম্পা.), *দেশবন্ধু রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, তুলি-কলম, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৪৬।

রেজিনা বেগম, *রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৬।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎরচনাবলী* (২য় খণ্ড), তুলি কলম, কলকাতা, ১৯৮৯।

শিশিরকুমার বসু (সম্পা.), *শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯।

শিশিরকুমার বসু (সম্পা.), *শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০।

সুভাষচন্দ্র বসু, *পত্রাবলী*, শিশিরকুমার বসু (সম্পা.), নেতাজী রিসার্চ্চ ব্যুরো, কলিকাতা, ১৯৬৪।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, চতুর্থ সংস্করণ, প্রথম সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৮।

হেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, *দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন*, পারুল, কলকাতা, ২০১৫।

হেনা চৌধুরী, *দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন-বেদ*, আলফা-বিটা পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ১৯৭১।

ভারতী রায়, "স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলাদেশে নারী জাগরণ (১৯১১-২৯)", রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, গৌতম নিয়োগী (সম্পা.), *ভারত ইতিহাসে নারী*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৯।

মহীবুল আজিজ, "নজরুল ও তাঁর নায়ক" *শব্দসমর ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, খড়িমাটি, চট্টগ্রাম, ২০১৯।

রাণু মিত্রী, "অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১-২২) ও বাসন্তী দেবী", সৌভিক বন্দোপাদ্যায়, (সম্পা.), *ইতিহাস অনুসন্ধান-৩২*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০১৮।

রাণু মিত্রী, "বাসন্তী দেবী স্মরণে", *স্মরণিকা*, তেত্রিশতম বার্ষিক সম্মেলন, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০১৭।

Krishna Bose, Important Women in Netaji's Life, *The Illustrated weekly of India,* 13.08.1972.

Leonard A. Gordon, *Brothers against the Raj, A biography of Indian Nationalist Sarat & Subhas Chandra Bose,* Rupa & Co, Calcutta, 1997.

Tara Chand, *History of the Freedom Movement in India,* Vol-IV, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi, 1972.